তৈত্তিরীয়োপনিষদ

যজুর্বেদ কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ নামে দুটি শাখায় বিভক্ত | কৃষ্ণযজুঃর্বেদের আরণ্যক হল তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং পাঁচটি উপনিষদ | তৈত্তিরীয় আরণ্যক দশ খণ্ডে বা প্রপাঠকে সমাপ্ত এবং তার সপ্তম, অষ্টম এবং দশম খণ্ডের সমষ্টি তৈত্তিরীয় উপনিষদ | এই উপনিষদে প্রাচীন ভারতে আরণ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকগণের সমাবর্ত্তনোত্সবে যে অতুলনীয় দীক্ষান্তভাষণ প্রদত্ত হত তা লিপিবদ্ধ আছে | বালক ভৃগুর পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, অন্নময় হতে আনন্দময় পর্যন্ত দেহীর পঞ্চকোশ এবং আত্মার আনন্দস্বরূপ কীর্ত্তিত হয়েছে | ব্রহ্মের সত, চিত, আনন্দ এই তিনটি স্বরূপ লক্ষণের আনন্দ লক্ষণটি এই উপনিষদে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে | এই শিক্ষা অনুসারে নিজ জীবন গঠনকারী মানুষ ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সর্বোত্তম ফল এবং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে সমর্থ হয় - এটি বোঝানোর জন্য এই প্রকরণের নাম রাখা হয়েছে শিক্ষা-বল্লী | এই অনুবাকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অধিষ্ঠাতা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপে স্তুতি করে প্রার্থনা করা হয়েছে | এর তাত্পর্য হল এই যে, সমস্ত আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক শক্তিরূপে যিনি সকলের আত্মা - অন্তর্যামী পরমেশ্বর, তিনি সর্বপ্রকারে আমাদের জন্য কল্যানময় হোন | তিনি যেন আমাদের উন্নতি এবং সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরের উপলব্ধির পথে কোনোপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হতে না দেন | সকলের অন্তর্যামী ব্রহ্মকে আমরা নমস্কার করি | এইভাবে পরমাত্মার কাছে শান্তি প্রার্থনা করে সূত্রাত্মা প্রাণরূপে সমস্ত প্রাণীমধ্যে ব্যাপ্ত এই পরমেশ্বরকে বায়ুর নামে স্তুতি করি | হে সর্বশক্তিমান ! সকলের প্রাণস্বরূপ বায়ুময় পরমেশ্বর ! তোমাকে নমস্কার | তুমিই সমস্ত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম নামে ডাকব | আমি "ঋত" নামেও তোমাকে আহ্বান করব কারণ সকল প্রাণীর জন্য যে কল্যাণকারী নিয়ম বিদ্যমান, এই নিয়মরূপ ঋতের তুমিই অধিষ্ঠাতা | তথা আমি তোমাকে "সত্য" নামেও আহ্বান করব | কারণ সত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তুমি | এই সর্বব্যাপী অন্তর্যামী পরমেশ্বর আমাকে সত আচরণ এবং সত্য ভাষণ করার এবং সদ্বিদ্যা গ্রহণের শক্তি প্রদান করে এই জন্মমরণরূপ

সংসারচক্র থেকে আমাকে রক্ষা করুন | আমার আচার্যকে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করে সর্বত্র এই সত্যের প্রচার করার শক্তি প্রদান করে যেন তিনি তাঁকে রক্ষা করেন | এখানে "আমাকে যেন রক্ষা করেন" , "বক্তাকে যেন রক্ষা করেন" এই বাক্যগুলির দুবার উচ্চারণ শান্তিপাঠের সমাপ্তি সূচনা করে | ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ - এইভাবে তিনবার বলার অর্থ যে, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক - এই তিনপ্রকার বিঘ্নের যেন সর্বতোভাবে উপশম হয় | শ্রীভগবান শান্তিস্বরূপ, অতএব তাঁকে স্মরণ করলে সর্বপ্রকার শান্তি অবশ্যম্ভাবী | সেই সময় যে শিষ্য পরমাত্মার রহস্যবিদ্যর জিজ্ঞাসু হত, সে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের নিয়মগুলি পূর্ব থেকেই জানত | অতএব তাকে সতর্ক করার জন্য সংকেত যথেষ্ট | এই সংকেতগুলির ভাবার্থ এই যে, প্রতিটি শব্দ সাবধানে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করার অভ্যাস থাকা দরকার | কিন্তু যদি লৌকিক শব্দে নিয়মের পালন করা যায় তাহলেও বেদমন্ত্রের উচ্চারণ কিন্তু অবশ্য-ই শিক্ষানুসারে হোয়া উচিত | "ক", "খ" আদি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং "অ", "আ" আদি স্বরবর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ করা উচিত | দন্ত্য "স"-এর স্থানে "শ" অথবা "ষ"-এর উচ্চারণ করা উচিত নয় | "ব"(ওয়)-এর স্থানে "ব" -এর উচ্চারণ হওয়া অনুচিত | এইভাবে অন্য বর্ণের উচ্চারণে সতর্ক থাকা উচিত | এইভাবে কোনো বর্ণে কোনো স্থানে কি ভাব প্রকাশের জন্য উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে হবে, কোথায় নিম্নস্বরে, কোথায় বা মধ্যস্বরে উচ্চারণ করতে হবে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্তব্য | বেদমন্ত্রের উচ্চারণে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত | কোথায় কোন স্বর হবে তার জ্ঞান থাকা দরকার | কারণ মন্ত্রে স্বরভেদ হলে তার অর্থের পরিবর্তন হয় | অশুদ্ধ স্বরের উচ্চারণ করলে অনিষ্টের ভাগী হতে হবে |

মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলেছেন -

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাত্॥"

বহু প্রাচীনকালে ইন্দ্র কোনো কারণে বিশ্বরূপকে বধ করেছিলেন। বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রঘাতক পুত্রলাভের কামনায় এক আভিচারিক যাগের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ঐ যাগে "স্বাহেন্দ্রশত্রুবর্ধস্ব" এই মন্ত্রের উচ্চারণ করা হয়েছিল। ঐ মন্ত্রের অভীষ্ট অর্থ হল - "অগ্নিদেব ! তোমার উদ্দেশ্যে এই হবিঃ প্রদান করছি। ইন্দ্রের ঘাতক পুরুষরূপে তুমি বর্ধিত হও।" এখানে শত্রু শব্দের যৌগিক অর্থ "শাতয়িতা শময়িতা বা"। ইন্দ্রশত্রু পদে "ইন্দ্রস্য শত্রুঃ" এইরূপ বিগ্রহে ষষ্ঠীসমাস অথবা "ইন্দ্রঃ শত্রুঃ যস্য" এই বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাস হতে পারে। ষষ্ঠীসমাস ও বহুব্রীহিসমাসে স্বর ভিন্ন হয়। ষষ্ঠীসমাসে "সমাসস্য" এই সূত্র অনুসারে সমাসের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়। বহুব্রীহিসমাসে "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্বপদম" এই সূত্রানুসারে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হয়। ইন্দ্রশত্রুশব্দের পূর্বপদ ইন্দ্র, রণ্প্রত্যয়ান্ত। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম" এই সূত্রানুসারে তা আদ্যুদাত্ত হয়। ইন্দ্রশত্রুপদে বহুব্রীহিসমাস হলে সমস্তপদ আদ্যুদাত্ত হবে। প্রকৃতস্থলে ইন্দ্রশত্রুপদে ষষ্ঠীসমাস বিবক্ষিত। অগ্নি ইন্দ্রের শত্রু, শাতয়িতা অর্থাত ঘাতক হোন, ত্বষ্টার এইরূপ অভিপ্রায়। কাজেও এক্ষেত্রে সমস্তপদ অন্তোদাত্ত হওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু ঋত্বিক প্রকাদবশতঃ ইন্দ্রশত্রুপদটিকে আদ্যুদাত্তরূপে পাঠ করলেন। ফলে অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে গেল। ইন্দ্রশত্রুপদে বহুব্রীহি সমাস হওয়ায় ইন্দ্র যার শত্রু বা শাতয়িতা এইরূপ অর্থ বোধিত হল। অনুষ্ঠিতযাগের ফলস্বরূপ ত্বষ্টা যে পুত্র লাভ করলেন, সেই পুত্র বৃত্র ইন্দ্রের ঘাতক হল না বরং ইন্দ্রকর্তৃক নিহত হল। ইত্বিকের স্বরজ্ঞানের অভাবে এই বিপর্যয়। আচার্য সংহিতাবিষয়ক উপনিষদের ব্যাখ্যা করার প্রতিজ্ঞা করে তার অর্থ নিরূপণ করেছেন। বর্ণগুলির অতিশয় সন্নিধি হলে সংহিতা হয়। সেই সংহিতা-দৃষ্টি যখন ব্যাপকরূপে ধারণ করে লোকাদিকে নিজের বিষয় করে, তখন তাকে মহাসংহিতা বলা হয়। সংহিতা বা সন্ধি পাঁচ প্রকারের হয় - স্বর, ব্যঞ্জন, স্বাদি, বিসর্গ এবং অনুস্বার - এগুলি-ই পঞ্চসন্ধি নামে অভিহিত। বস্তুত এগুলি সন্ধির পাঁচটি আশ্রয়। এইভাবে পূর্বোক্ত মহাসংহিতা অথবা মহাসন্ধিরও পাঁচটি আশ্রয় - লোক, জ্যোতি, বিদ্যা, প্রজা আত্মা (শরীর)। এর তাত্পর্য এই যে, যেরূপ বর্ণসমূহে সন্ধি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই লোকাদিতেও সংহিতা

দৃষ্টি করা উচিত | তা কীরূপ হবে, সেটি এখন বোঝানো হচ্ছে | প্রত্যেক সন্ধির চারটি ভাগ থাকে - পূর্ববর্ণ, পরবর্ণ, উভয়ের মিলনে উত্পন্ন রূপ তথা উভয়ের সংযোজক নিয়ম | এইভাবে এখানে যে সংহিতা দৃষ্টি লোক আদিতে বল হচ্ছে, তারও চার বিভাগ থাকে - পূর্বরূপ, উত্তররূপ, সন্ধি এবং সন্ধান (সংযোজক) |